ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▷

নকল ও ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করুন

বাংলাদেশে সম্প্রতি অসংখ্য ওষুধের দাম দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুযোগটা দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওষুধ উৎপাদনের নাম করে বিভিন্ন ওষুধ কম্পানির কাঁচামাল কিনে নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে

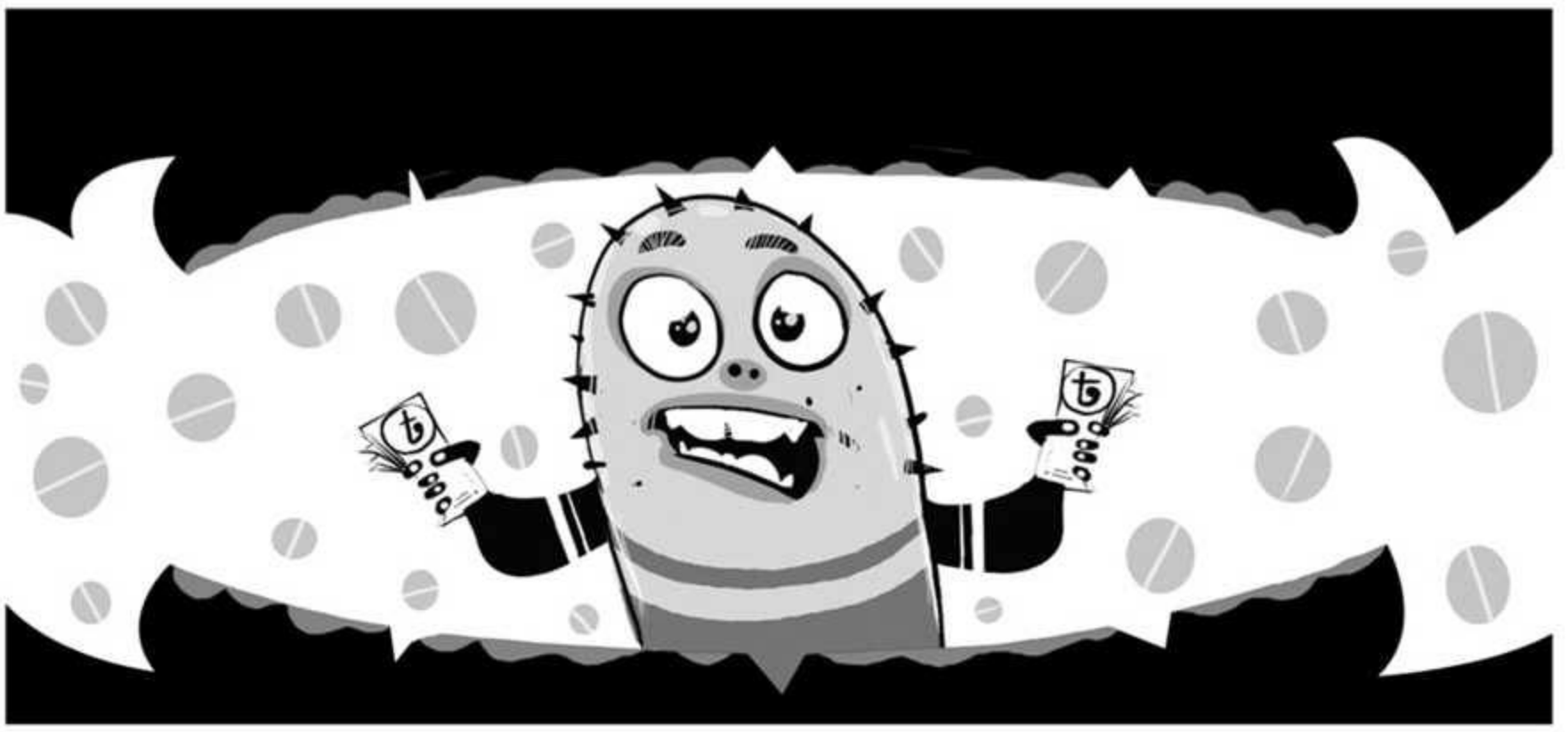

গত ১০ মে দেশে ভেজাল ও নকল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ রোধে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মো. নাসিমের নেতৃত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ওষুধশিল্প সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেকোনো মূল্যে নকল ও ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধে সরকার ও ওষুধ কম্পানিগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ওষুধ হচ্ছে মানুষকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম। আর সেই ওষুধ নকল ও ভেজাল করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বৈঠকে বেশ কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু পদক্ষেপগুলো কী তা জানা যায়নি।

১১ মে কালের কণ্ঠে তৌফিক মারুফের 'ভেজাল ও নকল ওষুধের ছড়াছড়ি' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। একই দিন অন্য একটি জাতীয় দৈনিকে 'ভিটামিনে মরণফাঁদ' শীর্ষক আরেকটি প্রতিবেদন পড়লাম। দুটো প্রতিবেদনেই নকল ও ভেজাল ওষুধ সম্পর্কে যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা পড়ে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও পত্রিকাগুলো নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তসহ হরেক রকম প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। দিন দিন যেন নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে, আর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তাহীনতা। একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, অনেক ক্ষেত্রে নকল, ভেজাল ওষুধ ধরা পড়ছে, দুর্নীতিবাজ ও দুষ্কৃতকারীরাও আটক হচ্ছে। ১৯৪০ সালের ড্রাগ অ্যাক্টের আওতায় নগণ্য শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে। অপরাধের তুলনায় শাস্তির মাত্রা এতই কম যে তাতে অপরাধ ও অপরাধীর ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না। নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি করার মাধ্যমে মানুষ হত্যার শাস্তি এক বা দুই লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক, দুই বা তিন মাস জেল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে আইনকানুন পরিবর্তন করে আরো কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে, যাতে করে আর কেউ কোনো সময় নকল, ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করার সাহস না পায়।

আসল ওষুধের নামে ও অবয়বে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে নকল উপকরণ দিয়ে, না দিয়ে বা ভেজাল দিয়ে উৎপাদিত ওষুধকে নকল ওষুধ বলে। ব্র্যান্ড ওষুধের মতো জেনেরিক ওষুধও নকল হয়। অনেক ওষুধে ঠিক উপকরণটি ব্যবহার করা হলেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। এসব ওষুধকে নিম্নমানের ওষুধ বলা হয়। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ রোগীর জন্য কেন বিপজ্জনক তা খানিকটা বর্ণনা করা যাক। ওষুধ উদ্ভাবনের সময় দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকরা নির্ধারণ করেন, কোন ওষুধে রোগ সারানোর জন্য কী পরিমাণে সক্রিয় উপাদান থাকতে হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটে সক্রিয় উপাদান হিসেবে প্যারাসিটামল থাকে ৫০০ মিগ্রা। সক্রিয় উপাদানের সঙ্গে আয়তন বাড়ানোর জন্য স্টার্চ, ল্যাকটোজ বা অন্যান্য নিষ্ক্রিয় উপাদান যোগ করাসহ ট্যাবলেটের আকার-আকৃতি প্রদানের জন্য অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে ওষুধের পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করা হয়। অনেক সময় সক্রিয় উপাদানের পরিমাণ এত কম থাকে যে (যেমন ১ মিগ্রা) তা দিয়ে ওষুধের আকার-আকৃতি প্রদান করা যায় না। তাই নিষ্ক্রিয় উপকরণ মিশিয়ে আয়তন বাড়িয়ে ওষুধ তৈরি করা হয়। ওষুধে সক্রিয় উপাদান না থাকলে তাকে ওষুধ বলা যাবে না। প্যারাসিটামল ব্যবহার না করেই শুধু স্টার্চ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে এমন ট্যাবলেট তৈরি করা যায়, যা দেখলে মনে হবে হুবহু একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। সক্রিয় উপাদান না থাকার কারণে এমন ওষুধ খেলে ব্যথা-বেদনা বা জ্বর সারবে না। তাই এসব ওষুধকে বলা হয় নকল ওষুধ। সামান্য ব্যথা বা জ্বর সারানোর জন্য নকল প্যারাসিটামল ব্যবহারের কারণে রোগ না সারলেও তা আপনার জীবনের জন্য বিপজ্জনক নাও হতে পারে; যদিও তা অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। কিন্তু এমন সব রোগ আছে যে ক্ষেত্রে আপনি ওষুধ সঠিক মাত্রায় সেবন না করলে রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে এবং একসময় রোগী মারাও যেতে পারে। সংক্রামক রোগের কথাই ধরা যাক। সংক্রামক রোগের প্রতিকারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার অপরিহার্য। জীবাণু দ্বারা শরীর বা শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর ও জীবাণুর মধ্যে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শরীর তার প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বারা বা অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা সৃষ্ট হয়ে ওঠার জন্য জীবাণু ধ্বংস করার কাজ চালিয়ে যায়। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল বা নষ্ট হয়ে গেলে ও কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক সেবন না করা হলে জীবাণু শরীর ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে। তার অর্থ হলো, স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও পরে অবধারিত মৃত্যু। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করে কার্যকারিতা না পেয়ে চিকিৎসক বা রোগী একের পর এক অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করতে থাকে। এভাবে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে জীবাণু ওষুধের কার্যকারিতাকে নিষ্ফল করে দিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে শরীরে বহাল তবিয়তে টিকে থাকতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বর্তমান বিশ্বের ভয়ানক বিপদগুলোর মধ্যে অন্যতম বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে বেশি পরিমাণে সক্রিয় উপাদান থাকলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়ায় রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে রোগী মারাও যেতে পারে।

হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপকে 'সাইলেন্ট কিলার' বা নীরব ঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর লাখ লাখ লোক উচ্চরক্তচাপে মৃত্যুবরণ করে। উচ্চরক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুটো মরণঘাতী রোগ হলো হৃদরোগ ও স্ট্রোক। হৃদরোগ ও স্ট্রোকে আক্রান্ত মানুষ অকর্মণ্য হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। প্রাকৃতিক উপায়ে অথবা লাইফস্টাইল পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হলে রোগীকে ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। ওষুধ যদি আসল ও গুণগত মানসম্পন্ন হয়, তবে রোগী ওষুধ সেবন করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। আর ওষুধ যদি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের হয়, তবে রোগীর কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখুন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সারা বিশ্বে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোতে অসংখ্য রক্তচাপের ওষুধ নকল হচ্ছে এবং ওষুধ সেবন করে অগণিত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও জীবন দিচ্ছে। ক্যান্সার প্রাণঘাতী রোগ। এ রোগ প্রতিকারে এখনো খুব বেশি কার্যকর ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। আর যেসব ওষুধ বাজারে প্রচলিত আছে সেগুলোর দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অ্যাডাস্টিন একটি বহুল প্রচলিত ক্যান্সারের ওষুধ। অ্যাডাস্টিনের একটি মাত্র ভায়ালের দাম আড়াই হাজার ডলার (দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা)। গত বছর এ ওষুধের মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ২.৭ বিলিয়ন ডলার। ওষুধ নকলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাস্তি হলো জেল। নকল ওষুধ প্রস্তুতকারকরা খুব অল্প সময়ে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে ফেলতে পারে এবং তারা ধরা পড়লে খুব বেশি হলে ছয় মাসের মতো জেলে থাকতে হয়। নকল ওষুধের জন্য ব্যবসায়ীদের যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য জিনিসের জন্য মাত্র ৫০ হাজার টাকার মতো খরচ করতে হয়। অল্প খরচে এটা তো অনেক লাভজনক ব্যবসা। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, অসাধু নকলবাজ ব্যবসায়ীরা অ্যাভাস্টিনের নকল ভার্সন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মাল্টিমিলিয়ন ডলারের লাভজনক ব্যবসাটি হাতিয়ে নিয়েছে। নকল অ্যাভাস্টিন এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে ক্যান্সারের রোগীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা ওসব ওষুধ বেশি নকল করে, যেগুলো বিক্রির দিক থেকে শীর্ষস্থানীয়। ফাইজারের কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ লিপিটর (জেনেরিক : অ্যাটরভাস্টেটিন) বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্লকবাস্টার ওষুধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও লিপিটরের নকল পাওয়া যায়। ২০০৭-০৮ সালে নকল হেপারিনের (যে ওষুধ রক্তজমাট প্রতিহত করে) ব্যবহারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৯ জন মৃত্যুবরণ করে। এই নকল হেপারিন চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল।

পরিসংখ্যান মোতাবেক বিশ্বের ১৫ শতাংশ ওষুধ নকল। এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে নকল ওষুধের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। অ্যাঙ্গোলায় নকল ওষুধের পরিমাণ মোট ওষুধের ৭০ শতাংশ। ২০০৫ সালে ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)-এর হিসাবমতে, সারা বিশ্বে নকল ওষুধের বিক্রির পরিমাণ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। নকল ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলো হলো পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বহু দেশ, আফ্রিকা ও ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন। ওসব দেশে বেশি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদিত হয়, যেসব দেশে ওষুধশিল্পে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শিথিল ও আইনগত বাধ্যবাধকতার অভাব রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দুর্নীতির কারণে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ ও পণ্যের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম। কারণ ওসব দেশে ওষুধ ও ওষুধশিল্পের ওপর সরকারের কঠোর আইন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে। চীনে ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও নকলের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার বিধান আছে। ওষুধের অনলাইন বেচাকেনা বিশ্বজুড়ে নকল ওষুধের ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব বোর্ড অব ফার্মেসির মতে, ৯ হাজার ৬০০ অনলাইন ফার্মেসির মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ কম্পানি গুণগত মানের শর্ত পূরণ করে। এসব ফার্মেসির অধিকাংশই বিদেশি বলে এদের ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করা অবৈধ। অনেক ওষুধের জন্য আবার প্রেসক্রিপশন লাগে না। এ সুযোগে অসংখ্য নকল ও ভেজাল ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে যায়। আমি ওপরে উল্লেখ করেছি, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ কিভাবে নকল ওষুধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও জীবন দিচ্ছে। এ ছাড়া ওষুধ কম্পানিগুলো প্রতিবছর নকল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কারণে কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ প্রতিরোধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো হলো ফার্মাসিউটিক্যাল কম্পানি, পেশেন্ট অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, ওষুধ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গবেষক, প্রস্তুতকারক, সিকিউরিটি কম্পানি, লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনলাইন ফার্মেসি ও ইন্টারনেট টেকনোলজি কম্পানি। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপীয় ট্রেড কমিশন অ্যান্টি-কাউন্টারফিটিং ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (নকলবিরোধী বাণিজ্য চুক্তি) সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন করেছে। চুক্তিতে পেটেন্ট রুল সংরক্ষণ, নকল ওষুধ বিক্রি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও এই সমস্যা সমাধানে বৃহত্তর সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করার বিধান রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নকল ওষুধের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে কমে যাবে। তবে নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ প্রতিরোধ এত সহজ হবে না, বিশেষ করে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে। কারণ এসব দেশে মাথাপিছু আয় নগণ্য হওয়ার কারণে দামি ওষুধ কেনার সামর্থ্য না থাকায় মানুষ সস্তায় ওষুধ পেতে চাইবে। ওষুধের দাম বেশি হলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল ওষুধ উৎপাদনে ও বিক্রিতে বেশি উৎসাহী হয়। এ ফর্মুলা ওষুধ কম্পানিগুলোর ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়। বাংলাদেশে সম্প্রতি অসংখ্য ওষুধের দাম দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগটা দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওষুধ উৎপাদনের নাম করে বিভিন্ন ওষুধ কম্পানির কাঁচামাল কিনে নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নাকের ডগায় বছরের পর বছর খোলাবাজারে কাঁচামাল বিক্রি হয়ে এলেও রহস্যজনক কারণে তারা এই অবৈধ বেচাকেনা বন্ধ করে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়নের ফলে আজকাল আসল আর নকল ওষুধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শুধু জানা যায় কোনটা আসল আর কোনটা নকল ওষুধ। তার পরও কিছু চিহ্ন আর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নকল ওষুধ চেনা যায়। নকল ওষুধের অদ্ভুত ধরনের গন্ধ, স্বাদ ও রং থাকে। নকল ওষুধ অতিসহজে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় বা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ওষুধের প্যাকেটের গুণগত মান তেমন ভালো হয় না। লেবেলে নির্দেশনায় ভুল বানানের শব্দ থাকে ও নির্দেশনায়ও ভুল থাকতে পারে। নকল ওষুধের দাম অত্যন্ত কম হয়। আসল ওষুধের দামের সঙ্গে তুলনা করলে একই নকল ওষুধের দামের তারতম্য ওষুধের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কিছু উপায় আছে। উপায়গুলো অবলম্বন করলে নকল ও ভেজাল ওষুধের দৌরাত্ম্য থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে। আপনার পরিচিত দোকান থেকে ওষুধ কিনুন, যে দোকান বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ওষুধ কেনার পর ওষুধের প্যাকেট ভালো করে পরীক্ষা করুন। নকল ওষুধ হলে প্যাকেটে কোনো না কোনো ভুল বা ত্রুটি ধরা পড়বে। প্যাকেটের ভেতর যে লিফলেট রয়েছে তাও ভালো করে পড়ে দেখুন। সেখানেও অসংখ্য ভুল থাকতে পারে। ওষুধটি ভালো করে পরীক্ষা করুন। আসল ও নকল ওষুধের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। সন্দেহ হলে ওই দোকান থেকে ওষুধ কিনবেন না। বিদেশ ভ্রমণকালে আপনার সব ওষুধ সঙ্গে নিন। পথে-ঘাটে ওষুধ কিনবেন না। অচেনা-অজানা জায়গায় ও দোকানে ওষুধ কিনলে তা নকল হতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মাসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@gmail.com